এব্রো থেকে গাজা : আন্তর্জাতিকতাবাদের পুনর্জাগরণ

Posted on February 4, 2026 by Sushovan Dhar

For the first time I had ever been in a town where the working class was in the saddle… it was the kind of thing I had vaguely been waiting for all my life.

George Orwell, Homage to Catalonia

ইউরোপের শহরগুলোতে আজ আবার এক পুরনো দৃশ্য দেখা যাচ্ছে — মিছিলের স্রোত, পতাকা, ব্যানার, হাজারো কণ্ঠে এক সুর: “ফ্রি প্যালেস্টাইন!”। লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার থেকে রোমের পিয়াজ্জা ভেনেজিয়া, বার্লিনের আলেক্সান্ডারপ্লাট্জ থেকে আমস্টারডামের ড্যাম স্কয়ার — সর্বত্র যেন ইতিহাস ফিরে এসেছে। এই দৃশ্য যেন কোনো অচেনা ভবিষ্যৎ নয়, বরং অতীতের পুনরাগমন — ১৯৩০-এর দশকের সেই দিনগুলির মতো যখন ইউরোপের রাস্তায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যানার উড়েছিল এবং হাজারো মানুষ দেশের সীমানা

পেরিয়ে এক দূরের যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেই দেশটির নাম ছিল স্পেন। আজ সেই দেশ প্যালেস্টাইন। সময় আলাদা, কিন্তু নৈতিক প্রতিধ্বনি একই। উভয় ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ছিল — মানবসভ্যতা কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকবে?

লন্ডন, বার্লিন, আমস্টারডাম, রোম বা মাদ্রিদ— ব্যানারে ঢাকা সড়ক, মানুষের ঢল, নানা ভাষায় উচ্চারিত একটিই দাবী – অবরুদ্ধ জাতির স্বাধীনতা। প্রায় নব্বই বছর আগের এক স্মৃতি যেন ফিরে আসে— তখনও মানুষ গিয়েছিলেন স্পেনের প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে। আজ আর সেই সীমানা পেরোনো যদ্ধাবাহিনি নেই, নেই আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের রাইফেল হাতে লড়াই। কিন্তু নৈতিক স্পন্দন, সেই আন্তর্জাতিক সংহতির আত্মা, আজও ফিরে আসে— আজও গাজার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।

তখনও যেমন, এখনো তেমনি, প্রশ্ন ছিল সহজ কিন্তু গভীর— ফ্যাসিবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন? ১৯৩৬ সালে যখন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান শুরু হয় এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক ইউরোপ নীরব থাকে, তখন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব। তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন ‘ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড’— এমন এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ, যেখানে কোনো সরকার ছিল না। বরং নানবিধ আন্দোলন, শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী দলের সদস্যরা পৌঁছে গিয়েছিলেন স্পেনের জনগণের পাশে দাঁড়াতে। তাঁদের দেশ ছিল ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক— ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে যুদ্ধ।

আজ, প্রায় এক শতাব্দী পরে, ফিলিস্তিনের ভূমি নতুন করে বিশ্ব-নৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ২০২৩ থেকে ইউরোপ জুড়ে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমেছেন — গাজায় বোমাবর্ষণ, দখলদারি ও গণহত্যার বিরুদ্ধে। ১৯৩০-এর দশকে স্পেন ছিল মানবতার লড়াইয়ের প্রতীক; আজ সেই প্রতীকের নাম প্যালেস্টাইন। পার্থক্য শুধু এই— তখন সংহতির অর্থ ছিল অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া;

আজ তা রাস্তায় নেমে দাঁড়ানো, বন্দর অবরোধ করা, ইসরায়েলমুখী অস্ত্রবাহী জাহাজ আটকে দেওয়া অথবা সামাজিক মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। যুদ্ধক্ষেত্র বদলেছে— আরাগনের পাহাড় থেকে লন্ডনের স্কয়ারে— কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে একই: একটি জাতিকে যখন বিশ্বজোড়া রাষ্ট্রশক্তি মিলে পিষে মারে তখন আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ কেমন হবে?

ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড গঠিত হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি ছিল জীবন্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল, ১৮৭১-এর কমিউন, ও বিশ শতকের বিপ্লবী উত্তাপ তখনও জীবিত। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী, ওয়েলসের খনি শ্রমিক, নিউইয়র্কের নাবিক— সকলেই বিশ্বাস করেছিলেন যে স্পেনের লড়াই তাদের নিজের ভবিষ্যতের লড়াই। সেই যুদ্ধের পরাজয় মানে শুধু একটি প্রজাতন্ত্রের পতন নয় বরং ইউরোপের উপর নামতে থাকা ফ্যাসিবাদী অন্ধকারের সূচনা। সেই স্মৃতি মুছে যায় নি, যার সারকথা – মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোই ইতিহাসের সর্বোচ্চ মর্যাদা।

কিন্তু পৃথিবী বদলে গেছে। যে শিল্পশ্রমিক শ্রেণি এক সময় এমন সংহতির মেরুদণ্ড ছিলেন, তাঁরা আজ ছড়িয়ে গেছেন আউটসোর্সিং, অনিশ্চিত শ্রম ও গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে। যে বামপন্থী সংগঠন ও পার্টিগুলো একসময় আন্তর্জাতিক লড়াই সংগঠিত করত, তারা এখন দুর্বল, প্রাতিষ্ঠানিক বা লুপ্ত। কমিনটার্ন নেই, আছে এনজিও, নেটওয়ার্ক ও বিছিন্ন সামাজিক আন্দোলন। কিন্তু যা টিকে আছে তা হল সেই মৌলিক নৈতিক তাড়না— যে অন্যায়ের মুখে নীরব থাকাকে অপরাধে অংশগ্রহণ বলে মনে করে। সেই তাড়নাই আজ ইউরোপের রাস্তায় ফিরে এসেছে, প্যালেস্টাইনের পতাকা হাতে।

২০২৫ সাল জুড়ে ইউরোপের রাস্তাগুলি যেন এক সজীব ইতিহাসের প্রতিধ্বনি হয়ে উঠল। আমস্টারডাম, রোম, লন্ডন, মাদ্রিদ, বার্লিন— সর্বত্র মানুষ নেমে এলো, হাতে পতাকা, কণ্ঠে স্লোগান। ইতালিতে সাধারণ ধর্মঘট পঙ্গু করে দিল একাধিক শিল্পাঞ্চল; নগর প্রশাসনগুলিকে, নেপল্স থেকে গ্লাসগো পর্যন্ত,

মানুষ ঘোষণা করল “City for Palestine”। এ শুধুমাত্র সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়, এ এক রাজনৈতিক উচ্চারণ। প্যালেস্টাইন প্রশ্নে ইউরোপীয় সরকারগুলির ভণ্ড ভূমিকা তাঁদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। যারা মুখে মানবাধিকারের কথা বলে তারাই আজ গাজার আগুনে জ্বালানি যোগাচ্ছে। গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে এই বর্বরতা আজকের ইউরোপকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

যেভাবে স্পেন তৎকালের নৈতিক প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল, প্যালেস্টাইন আজ সেই ভূমিকায়। ১৯৩০-এর দশকে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ফ্যাসিবাদকে তোষণ করেছিল; তারা “নিরপেক্ষতা”র নামে আসলে স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। আজও একই দৃশ্য, পশ্চিমা শক্তিগুলি “আইন ও নিরাপত্তা”-র বুলি আওড়ে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে খোলাখুলি সমর্থন দিচ্ছে – যে রাষ্ট্র একটি জাতিকে পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংস করছে। ইতিহাস যেন আবারও পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, শুধু স্থান-কাল পাল্টেছে, যুক্তি পাল্টেছে, কিন্তু নিষ্ঠুরতার চেহারা আরও ভয়ানক।

তবে এই সাদৃশ্যের মধ্যেও আছে একটি মৌলিক পার্থক্য। ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড ছিল এক আত্মবিশ্বাসী, সংগঠিত শ্রমিক আন্তর্জাতিকতার ফল। আজকের প্যালেস্টাইন সংহতি আন্দোলন জন্ম নিয়েছে এক খণ্ডিত বিশ্বে— যেখানে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, শ্রেণি ও সংস্কৃতির মানুষ একত্রিত হন কিন্তু কোনো সম্মিলিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বাঁধন নেই। এই বৈচিত্র্য তার শক্তি, কিন্তু একই সঙ্গে দুর্বলতাও। ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্রকল্পের অভাবে সংহতি সহজেই হয়ে উঠতে পারে নৈতিক প্রতিক্রিয়া, ক্ষণিকের আবেগ, বা কেবল প্রতীক। ১৯৩০-এর দশকে শ্রমিকরা রাইফেল হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন; আজ মানুষ রাস্তায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বা ডিজিটাল পরিসরে লড়ছেন। লড়াইয়ের পরিসর বেড়েছে, কিন্তু সংগঠনের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে।

তবু একে খাটো করে দেখা ভুল হবে। আজকের আন্তর্জাতিক ব্রিগেড সশস্ত্র নয় — তাঁরা চিকিৎসক, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষার্থী, শ্রমিক, যাঁরা

প্রত্যেকে নিজের অনুভূতি থেকে সেট্লার-উপনিবেশবাদী দমননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। গাজার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যাঁরা চিকিৎসা দিচ্ছেন, ইউরোপের বন্দরে যাঁরা অস্ত্রবাহী জাহাজ আটকাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা বয়কটের দাবি তুলছেন— তাঁরা এক নতুন ধরনের নৈতিক সাহসের উত্তরাধিকারী। এই বিচ্ছিন্ন উদ্যোগগুলিই ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে এক নবীন আন্তর্জাতিক চেতনা। এমন এক চেতনা যা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যুগে মানবমুক্তির ভাষা পুনর্নির্মাণ করছে।

স্পেন একদিন ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতীক; আজ সেই প্রতীকের নাম প্যালেস্টাইন। প্রশ্ন হল, আমরা কি শোষণ, দমন, ধ্বংসের মধ্যে তলিয়ে যাব নাকি মুক্তি ও সংহতির ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ে তুলব? যাঁরা একদিন আইবেরিয় উপদ্বীপের এব্রো নদীর তীরে লড়াই করেছিলেন, তাঁরাই আজ বার্লিন বা লন্ডনের রাস্তায় মিছিল করছেন। তাঁরা আলাদা সময়ের মানুষ হলেও এক অভিন্ন নৈতিক সূত্রে বাঁধা – অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ থাকার অর্থ আসলে অন্যায়েরই পক্ষে দাঁড়ানো।

তুলনা করতে গিয়ে মাথায় রাখতে হবে যে প্রেক্ষাপট বদলেছে। স্পেন তার প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে লড়ছিল; প্যালেস্টাইন এখনো রাষ্ট্রহীন, দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে টিকে থাকার সংগ্রাম করছে। স্পেনের প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন; প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়ানো রাষ্ট্রের সংখ্যা গুটিকতক। তাকে সমর্থন করার পরিণাম আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, কালো তালিকাভুক্তি, দমননীতির সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদ এখন কেবল উপনিবেশ নয়— একটি আর্থিক ব্যবস্থা, অস্ত্রশিল্প, নজরদারি প্রযুক্তি ও প্রচারযন্ত্রের জটিল জাল। সংহতিকেও তাই নতুন রূপ নিতে হয়েছে; বয়কট, তথ্যযুদ্ধ, সাপ্লাই চেইনে ব্যাঘাত এবং জনমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

এই নতুন প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিকতার মানে কী, সেটিই আজকের প্রধান প্রশ্ন।

একসময় “দুনিয়ার মজদুর এক হও!” ছিল বাস্তব আহ্বান— শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তিতে গড়া আন্তর্জাতিক ঐক্য। আজ শ্রমিক বিশ্বায়িত হলেও সংগঠন ভেঙে পড়েছে; উৎপাদন আন্তর্জাতিক হলেও শ্রেণী সংহতি জাতীয় সীমানার বেড়া টপকাতে পারছে না। তবু গাজা আন্দোলন দেখাচ্ছে এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত: বার্সেলোনা ও জেনোয়ার শ্রমিকরা ইসরায়েলমুখী অস্ত্রবাহী জাহাজ নামাতে অস্বীকার করছেন; শিক্ষকদের সংগঠন শ্রেণিকক্ষেই উপনিবেশবিরোধী ইতিহাস শেখাচ্ছেন; জলবায়ু আন্দোলনকারীরা বসতি-উচ্ছেদ আর প্রকৃতিধ্বংসের মধ্যে যোগসূত্র টানছেন। এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হয়তো এক নবীন বৈশ্বিক শ্রমিক রাজনীতির ভ্রূণ— ছিন্নবিচ্ছিন্ন, কিন্তু সম্ভাবনাময়।

এই প্রতিবাদের ঢেউ ইউরোপের রাজনৈতিক ভূগোলও বদলে দিয়েছে। সরকারগুলি যেখানে ইসরায়েলকে “নিরাপত্তা”র নামে রক্ষা করে, জনগণ সেখানে গাজার জন্য রাস্তায় নেমে আসেন। ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি— সর্বত্র সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও লাখ লাখ মানুষ মিছিল করেছেন। ব্রিটেনে লেবার পার্টির নেতৃত্ব যখন ইসরায়েলের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মেলায়, তখন দলটির তৃণমূল থেকে শুরু হয় তীব্র বিদ্রোহ। জার্মানিতে “রাষ্ট্রনীতির অংশ” হিসেবে ইসরায়েল সমর্থনের সরকারি মতবাদ আজ নতুন প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; তাঁরা জানেন, স্মৃতির দায়বদ্ধতা মানে আরেকটি জাতিকে দমন নয়। এই ভাঙনগুলোই ইঙ্গিত দেয়— যেমন একসময় স্পেন ইউরোপের নৈতিক পরীক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল, আজ সেই ভূমিকা নিয়েছে প্যালেস্টাইন।

বিরোধ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। একদিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়া-উদারবাদী যুগ, যেখানে রাজনীতি অর্থহীন ভোগবাদে নিমজ্জিত; অন্যদিকে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে আসছে এক অবদমিত জাতির পক্ষে। এই বৈপরীত্যই আমাদের সময়ের চিত্র। আগের প্রজন্মের মতো আজকের আন্দোলনেও উচ্ছ্বাস ও সাহসের অভাব নেই; অভাব সংগঠনের, দিকনির্দেশের, রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার। ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড লাল পতাকার নিচে লড়েছিল; আজকের আন্দোলন নানা পতাকা ও হ্যাশট্যাগের নিচে ছড়িয়ে আছে। আন্তর্জাতিকতা যদি সংগঠনের ভিত না পায়, তবে তা কেবল নৈতিক

বোধে সীমাবদ্ধ থাকে; আবার সংগঠন যদি আন্তর্জাতিক চেতনা হারায়, তবে তা হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ ও আমলাতান্ত্রিক। সমসাময়িক বামপন্থার কাজ এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটানো – আবেগ ও সংগঠন, নৈতিকতা ও রাজনীতি।

ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের আদর্শ মুছে যায়নি। তাদের পরাজয়ের মধ্যেই বেঁচে ছিল ভবিষ্যতের প্রতিরোধের বীজ। “No Pasaran” আজও প্রতিবাদের প্রতীক। গাজার জন্য আন্দোলনও হয়তো সামরিক বিজয় আনতে পারবে না, কিন্তু এর স্থায়িত্ব ও নৈতিক দৃঢ়তা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে একটি নতুন আন্তর্জাতিক চেতনা জন্ম নিচ্ছে। এটি সেই চেতনা, যা সাম্রাজ্যবাদকে কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং এক বাস্তব সম্পর্ক হিসেবে বোঝে। ইউরোপের সীমান্তরক্ষী কাঁটাতার থেকে গাজার প্রাচীর পর্যন্ত, অভিবাসী শ্রমিকের নজরদারি থেকে রাফার ড্রোন হামলা পর্যন্ত, বৈশ্বিক শ্রমের অনিশ্চয়তা থেকে প্যালেস্টাইনের উচ্ছেদের ইতিহাস পর্যন্ত – একটিই কাঠামো, একটিই আক্রমণ।

অতএব স্পেন ও প্যালেস্টাইনের তুলনা মানে কেবল অতীতের স্মৃতিচারণ নয়; এটি এক আহ্বান – যে আন্তর্জাতিকতা আজ মৃত নয়, বরং রূপ বদলে বেঁচে আছে। একসময় তার ভাষা ছিল মার্কসবাদী; আজ তাতে মিশেছে নারীবাদী, পরিবেশবাদী ও আরও নানা পরিচিতির চিহ্ন। কিন্তু মূল বিশ্বাস একই – মুক্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতির বিষয় নয়, মানবতার সামগ্রিক প্রশ্ন। সীমানা দিয়ে স্বাধীনতা ভাগ করা যায় না।

এই নতুন আন্তর্জাতিকতাকে রাজনৈতিক কৌশলে রূপান্তরিত করাই আজকের বামপন্থার প্রধান কাজ। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সেই অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া, যা ইসরায়েলি দখলদারি ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখে। নতুন আন্তর্জাতিকতা যদি পুরোনো আন্তর্জাতিকতার নৈতিক স্বচ্ছতা ফিরে পায়; যদি বুঝতে পারে, সাম্রাজ্যবাদ কোনো বাইরের শক্তি নয়, বরং পুঁজিবাদেরই অভ্যন্তরীণ যুক্তি— তবেই তা হবে সত্যিকারের বিপ্লবী শক্তি।

১৯৩৮ সালের শরতে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের শেষ দলটির বার্সেলোনার রাস্তায় বিদায় মিছিলকে লাখো মানুষ অভিবাদন জানিয়েছিলেন। স্পেনের প্রজাতন্ত্র তখন পতনের মুখে, কিন্তু সেই মিছিলই জানিয়ে দিয়েছিল— পরাজয় সত্ত্বেও সংহতি কখনো পরাজিত হয় না। আজ যখন গাজার আকাশ আগুনে লাল, ইউরোপের সরকারগুলো চোখ ফিরিয়ে নেয়, সেই স্মৃতিই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়— আন্তর্জাতিকতা কোনো অতীতের স্মৃতি নয়, বরং বর্তমানের দায়িত্ব। এব্রো থেকে গাজা পর্যন্ত, লড়াই এখনো চলেছে— রূপ বদলেছে, ভৌগোলিকতা বদলেছে, কিন্তু আত্মা অটুট।

“We suffer from an incurable disease: hope.”
— Mahmoud Darwish

(এই প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে অনীক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে)

About the Author

Sushovan Dhar
Author

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint

View All Posts

Sushovan Dhar

+ posts

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint